চতুর্থ অধ্যায়

সমকালীন পণ্য সংস্কৃতি বনাম বরাকের চা বাগিচার জনগোষ্ঠী ও জনজীবন

- সভ্যতার আদিকাল থেকেই সংস্কৃতির সূত্রপাত। বস্তুত বাঁচার প্রয়োজনে মানুষ যে ব্যবহারিক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছে তারই অনিবার্য অনুষঙ্গে প্রকাশ হয়েছে তার মানস সম্পদ সঞ্জাত অভিব্যক্তিগুলি। 'সংস্কৃতি' শব্দটির তাৎপর্য নিয়ে ভাবলে দেখা যাবে 'সংস্কৃতি' শব্দের আড়ালে দুটি ব্যঞ্জনা রয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরি হওয়া কোনও প্রত্যয় বা ধারণা, যা অধিকাংশ সময়েই পরিবেশ, পরিবার, সমাজ প্রভৃতির প্রভাবে গড়ে ওঠে, এবং পরিবর্তনশীল, পরিমার্জনা, সুন্দরভাবে বিন্যাস করা ইত্যাদি । আরও একটি তাৎপর্য হল মানুষের সভ্যতার সামগ্রিক বিকাশের সঙ্গে তা বিজড়িত । নাচ, গান, অভিনয়, আবৃত্তি, কলা, ভাস্কর্য ইত্যাদি নানাবিধ কলাবিদ্যার মধ্যেই তার পরিচয় নিহিত থাকে । বৈজ্ঞানিক লুইস হেনরি মর্গ্যান এর একটি সূত্র নির্দেশ করে তিনি দেখিয়েছেন যে

> "মানুষের সভ্যতার বিবর্তন সমস্ত দেশ কাল সমাজেই ঘটেছে একটি সুনির্দিষ্ট ছকে বাঁধা হয়ে। এই বিবর্তন ঘটেছে এবং এখনও ঘটছে, পারস্পরিক কতকগুলি স্তর থেকে স্তরান্তরে যাওয়ার মাধ্যমে। কোনও জাতি বা গোষ্ঠী বা পরিবেশ, অর্থনৈতিক বিকাশ অথবা অন্য কোনও কিছু কারণের জন্য বিবর্তনের একটি স্তরে এসে হয়তো আটকে রয়েছে, অন্য কোনও জাতি বা কোম হয়তো সে স্তর পেরিয়ে গেছে দীর্ঘদিন আগেই এবং হয়ত বা তৃতীয় কোনও গোষ্ঠী উপযুক্ত

পারিবেশিক ও আর্থনীতিক সুযোগের অভাবে ঐ স্তরে, তখনও উঠতেই পারেনি, আটকে রয়েছে নিচের দিকের কোনও একটা ধাপ।"[১]

মানুষের জীবনযাত্রার ধরণ ধারণ পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে যতই বদলে বদলে যায়, ততই তার সামাজিক অভিব্যক্তিগুলিও পাল্টাতে থাকে ।

একুশ শতকে দাঁড়িয়ে যে শব্দটা আমাদের সব থেকে বেশি নাড়া দেয় সেটা হচ্ছে বিশ্বায়ন । "বিশ্বায়ন বা গ্লোবালাইজেশ্যান শব্দটি একটি বিশেষ অর্থনৈতিক স্বার্থের অনুষঙ্গে সৃষ্টি হলেও অনিবার্যভাবে তার প্রতিভাস এসে পড়েছে সমাজ এবং সংস্কৃতির ওপরেও।"[২] আমাদের জীবনযাত্রায়, সংস্কৃতিতে যার প্রভাব বিস্তর । খুব সাধারণ ভাবে বললে বলা যায় বিশ্বায়ন হলো একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে স্থানীয় বা আঞ্চলিক কোনো বিষয় বিশ্বব্যাপী বা আন্তর্জাতিক স্তরে ছড়িয়ে পড়ে । আর সমকালীন পণ্য সংস্কৃতি বনাম বরাক উপত্যকার চা বাগানের জনসমাজ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে বিশ্বায়ন এর উল্লেখ আমাদের করতেই হয় । খোলাবাজার বা মুক্তবাজারের দরুন সবকিছুই এখন হাতের মুঠোয় ; টাকার বিনিময়ে যা চাই তাই পেয়ে যাই । বিশ্বায়নের ঠেলায় আমরা হয়ে গেছি আধুনিক । কতটা আধুনিক সেই প্রসঙ্গে না হয় নাইবা যাওয়া গেল ; কিন্তু উত্তর উপনিবেশ পাঠ করতে গেলে প্রসঙ্গ তো এসেই যায় । আমাদের জীবন যাত্রায়, সাহিত্যে সংস্কৃতিতে সর্বত্রই আধুনিকতার ছোঁয়া । উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত হয়ে একেবারে নিম্নবিত্ত পর্যন্ত পৌঁছে গেছে এই আধুনিকতার ছোঁয়া সেটা নিশ্চয়ই বিশ্বায়ণের

কল্যাণেই । খবরের কাগজ, টিভি, মোবাইল, ফিল্ম প্রভৃতি খুব সহজেই জায়গা করে নিয়েছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে । যার ফলে আমরা নিজের অজান্তেই হয়তো শিকার হয়ে গেছি একটা অপসংস্কৃতির, ভুলে যেতে বসেছি নিজেদের ঐতিহ্য । আর এই বিশ্বায়ণের যোগান দিচ্ছে যে জিনিষ সেটা হচ্ছে বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞাপন আমাদের মগজ ধুলাই করে দিচ্ছে প্রতিনিয়ত। আমাদের বাধ্য করে দিচ্ছে টিভি মারফতে আসা পণ্য সামগ্রী গুলো কিনতে । খুব সহজেই বলতে পারা যায় যে বরাক উপত্যকার চা জনজাতির বা জনগোষ্ঠীর জীবনেও এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয় ।

বিশ্বায়নের মূলকাঠামোটা অর্থনৈতিক হলেও তার প্রারম্ভিক উন্মেষ অবশ্য হয়েছিল রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষণের কারণেই । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বে পূর্ব ইউরোপের অনেকগুলি দেশ, এশিয়ার চিন এবং ভিয়েতনাম ও কোরিয়ার অর্ধেকটা করে অংশ আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট প্রতিবেশী কিউবা একত্রে মিলে সমাজতন্ত্রী ভাবাদর্শে বিশ্বাসী যে একটি নুতন শক্তিজোট গড়ে তোলে, পশ্চিমি রাজনীতিবিদরা তাকে বলতে লাগলেন 'দ্বিতীয় বিশ্ব' । অবশ্যই 'প্রথম বিশ্ব' বলতে তাঁরা বোঝাতেন ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে নিবেদিত প্রাণ দেশগুলিকে অর্থাৎ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, সুইডেন অতি দ্রুত মহাযুদ্ধের বিপর্যয় থেকে সামলে ওঠা জার্মানি ইত্যাদিকে । এশিয়ার দেশ হওয়া এবং পারমাণবিক মারণাস্ত্রে বিধ্বস্ত হওয়া সত্ত্বেও, জাপানও খুব অল্পদিনের মধ্যে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে ঐ গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে পড়ে । এর বাইরে বিশ্বের সেইসব দেশ যারা হতদরিদ্র, যাদের বৃহৎ একটা অংশ সদ্য স্বাধীনতা অর্জন করেছে এবং ভাঙাচোরা, আধা কিংবা পুরো সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিকে অবলম্বন করে বাঁচতে চাইছে, যেমন,

ভারত, মিশর, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি এশিয়া আফ্রিকার বিভিন্ন রাষ্ট্র এঁরা অভিহিত হল 'তৃতীয় বিশ্ব' বলে। রাজনৈতিক আদর্শ নির্বিশেষে পৃথিবীর ছোটবড় প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রকেই আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্রের এই নতুন অস্ত্রটির কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য করেছে । 'প্রথম' এবং 'দ্বিতীয়' বিশ্বের মধ্যে রাজনৈতিক 'শীতল যুদ্ধের' দিনগুলোতে এইসব 'তৃতীয়' বর্গের দেশগুলো কখনও এদিক কখনও ওদিক হেলদোল করত এবং সেই রাজনৈতিক দোলের নাম ছিল 'জোট নিরপেক্ষতা'। এই দেশগুলি বস্তুতপক্ষে রাজনৈতিকভাবে আপাতদৃষ্টিতে স্বাধীন হলেও 'হ য ব র ল' মার্কা অর্থনীতির কারণে খুঁড়িয়ে চলত; সেই দেশগুলির কোটি কোটি মানুষকে নিয়ে গড়া ক্রেতা সাধারণ তথা পুরোপুরি কুক্ষিগত করারই শিষ্টপোষাকি নাম, 'বিশ্বায়ন'। খোলাবাজার বা মুক্ত বাজার বা বাজারীকরণ ব্যাপারটা হল, "গত কয়েক বছরে নানান পর্যায়ে 'বিশ্বসুন্দরী' খেতাবে ভূষিত করা হয়েছে মূলত ভারতীয় কয়েকজন মেয়েকেই । সেই কবে ১৯৬৬ সালে রীতা ফারিয়া ঐ খেতাব পেয়েছিলেন, তারপরে গোটা তিনেক দশক কেটে গেছে, আকস্মিভাবে হঠাৎই এদেশের মেয়েরা ঝাঁকে ঝাঁকে বিশ্বের সেরা সুন্দরী বলে ধার্য হচ্ছেন তাঁহা তাঁহা বিচারকদের চোখেঃ সুস্মিতা, ঐশ্বর্য, প্রিয়াঙ্কা, ডায়না, যুক্তা, লারা এবং আরও অনেকে । এই ব্যাপারটা কী ? অধিকাংশ ভারতীয় মেয়েরাই তো সহজসুন্দরী! তাহলে হঠাৎ, এভাবে ব্যাপক স্বীকৃতি পেতে লাগলেন কেন তারা ?

ব্যপারটা হল এই যে, এই সব প্রতিযোগিতাগুলির আসল পৃষ্ঠপোষক এবং প্রত্যক্ষ পরোক্ষ উদ্যোক্তা হচ্ছে বিশ্বের বড় বড় মালটি ন্যাশনাল কসমেটিকস্ কোম্পানিগুলি এবং এই একশ কোটি মানুষের দেশের

'খোলাবাজারটা' তাদের দখল করতেই হবে। আর তাই, এখানেও প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি গোষ্ঠী একপক্ষের উদ্‌যোগে 'মিস ইউনিভার্স', অন্যদের আয়োজনে 'মিস ওয়ার্ল্ড' প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।"[৩] এই বিশ্বায়ন এবং তার অবিচ্ছেদ্য অনুসূত্র হল উদারীকরণ এবং 'খোলা বাজার' কোনও দুর্বল অর্থনীতি সম্পন্ন রাষ্ট্রের নিজস্ব শিল্প এবং উপাদান ব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে স্তিমিত করে ফেলা। তার ফলে বিদেশি পণ্য কম শুল্কে, কিংবা সম্পূর্ণতই শুল্কহীনভাবে রাশি রাশি আমদানি হয় এবং স্বাভাবিক একটা আকর্ষণ থাকে সে সবের জন্যে, যার পরিণামে দেশি পণ্য আর বিকোতেই চায় না। এটা বিলাসদ্রব্যের ক্ষেত্রে যেমন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যবস্তুর বেলাতেও তেমনই ঘটে। মোটামুটি একই দামে মিললে মানুষ সহজাত প্রবণতার বশেই চটকদার বিদেশি বস্তু কিনবে। এর অভিঘাতে শুধু অর্থনীতিতেই নয়, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধগুলির একই সঙ্গে অবক্ষয় এবং রূপান্তর ঘটেছে। এই পালাবদলের কবলে পড়ছে লোকসংস্কৃতির নানাবিধ প্রকরণও। 'মুক্ত অর্থনীতি', 'খোলাবাজার', 'বিশ্বায়ন' ইত্যাদির প্রারম্ভিক এক্সপেরিমেন্ট শুরু গত শতাব্দীর আটের দশকে, প্রাক্তন সোভিয়েত রাশিয়ায়। গর্বাচেভের আমলে। এরই পরিণামে সেদেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বনিয়াদ ঝুর ঝুর করে ধ্বসে গেল এক দশকের মধ্যেই এবং সেই মহাপতনের অনুষঙ্গে সমগ্র পূর্ব ইউরোপেই সমাজতন্ত্রের অবক্ষয় ঘটল। ফলে সেইসব দেশে সামাজিক এবং নৈতিক মূল্যবোধগুলিও ভেঙে পড়তে থাকে।

বিশ্বায়ন তার ভাল-মন্দ সব নিয়েই এখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে 'উদারীকৃত' অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। মুক্ত অর্থনীতি এবং

বিশ্বায়নের হেড কোয়ার্টার বলে যে দেশকে উল্লেখ করা হয়, সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক চালচিত্রটি একবার নিরীক্ষণ করলেই আরও একটি ভাল উদাহরণ মিলবে এই প্রেক্ষিতে । ফোকলোর সংক্রান্ত যত থিওরিরই জন্মভূমি হোক না কেন মার্কিন দেশ, লোকসংস্কৃতির সেইসব প্রকরণগুলি সেই দেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে অনেক আগেই । পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতেও ধীরে ধীরে সেই অবক্ষয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে অনেকদিন হল। ভোগসর্বস্ব পণ্যব্যবস্থা, বাজার অর্থনীতি ইত্যাদি ব্যপারগুলো সামাজিক ক্ষেত্রেও বিপুল অভিঘাত ফেলছে । এবং ভবিষ্যৎ এ আরও ফেলার আশঙ্কাও রয়েছে ।

-অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর অনিবার্য ফল হল, বেকারি বৃদ্ধি, অবশ্য প্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদন হ্রাস, দেশজ পণ্যের নাভিশ্বাস ওঠা, ধনীর আরও ধনী হওয়া এবং গরীবের আরও গরীব হয়ে ওঠা ইত্যাদি সমাজবিরোধী শক্তিগুলির ক্ষমতা প্রতিপত্তির বৃদ্ধি, দেশের মধ্যে ধর্মীয়, রাজনৈতিক, জাতিগত, ভাষাগত, সাংস্কৃতিক এবং আরও অনেক অশান্তির উসকানি এগুলি হচ্ছে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অভিঘাতের মুখ্য উপকরণ । গণমাধ্যমগুলির চেহারা একটু দেখে নেওয়া যেতে পারে চলচ্চিত্র, বিভিন্ন টিভি চ্যানেল, সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন এগুলি যেহেতু বৃহৎ পুঁজির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত । নানা প্রলোভন দেখিয়ে সব বয়সী লোকদের ফাঁদে ফেলার চেষ্টা চলছে । শ্রম, নিষ্ঠা, অধ্যবসায়, অধ্যয়ন, শিক্ষা, মূল্যবোধ সবকিছুই তুচ্ছ এই বিশ্বায়ন সঞ্জাত ভোগসর্বস্বতার সামনে । বরাক উপত্যকার চা জনজাতিরাও এই ফাঁদ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারছে না ।

-অর্থনৈতিক উদারবাদ বলছে যে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনায় পণ্য উৎপাদন বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে সম্ভব । পণ্য উৎপাদনের কাঁচা মাল পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করা যায় । ফলে কোম্পানি, প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশ্বায়ণ আমাদের সমাজে নাকি অনেক সুযোগ সুবিধে এনে দিয়েছে যা মান্য ইতিহাসের কোনো পর্বে দেখা যায় নি । আমরা তা অস্বীকার করতে পারি না । বরং তা স্বীকার করেই বলব যেমন দিয়েছে তেমনই কেড়েও নিচ্ছে অনেক কিছু । সংস্কৃতির রূপ বলতে আমরা শিল্প, সাহিত্য, পরিবেশ, আচার আচরণ, চলা ফেরা, খাওয়া দাওয়া ইত্যাদিকে বোঝাই । সমাজে একজন মানুষ তার জীবন কালের সময়কে যে প্রথায় পরিচালনা করে সেই প্রথাই হলো মানুষের সংস্কৃতি । একটি জাতি, গোষ্ঠী, সমাজ বা দেশের সংস্কৃতি হলো সম্মিলিত । প্রত্যেক ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দেশের সংস্কৃতি আলাদা আলাদা হয়ে থাকে । সেই সংগে রয়েছে প্রত্যেক ধর্মের সমাজের নিজস্ব সংস্কৃতি । বলা হয়ে থাকে যে দেশের ব্যাক্তি মানুষ বা গোষ্ঠীর বা দেশের সংস্কৃতি যতবেশি উন্নত সেই দেশের সম্মান তত বেশি উন্নত। সংস্কৃতি হতে পারে রাজনীতির, সংস্কৃতি হতে পারে অর্থনীতির । বলতে বাধা নেই যে কিছু মানুষ নিজের স্বার্থের জন্য সংস্কৃতির অপপ্রচার করে অপসংস্কৃতিকে পুঁজি হিসেবে গ্রহণ করছে । সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতির ঢেউ আনা হচ্ছে দেশে, সমাজে । আর দেশের ইলেকট্রনিক মিডিয়া হয়তো লালন করে চলেছে সেই সংস্কৃতি নামক অপসংস্কৃতির । আর খুব অনায়াসেই বাঙালি মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্তের মতোই বরাকের চা জনজাতিরা ও সরিয়ে রাখতে পারে নি এর থেকে নিজেকে ।

একেবারে নিম্নবিত্ত শোষিত সমাজের শ্রমজীবী চা জনজাতিদের সংস্কৃতি চর্চার বিকাশ ঘটছে না বললেই চলে । যেখানে চা শ্রমিকরা 'পাতি তুলগো মিনি তিন পাতার নীচে / গলি পাহি ধর আগে আগে' এরকম নিজস্ব গান গেয়ে কাজে যেতো এখন সেরকম কিছু হচ্ছে না বরং সেখানে জায়গা করে নিয়েছে আধুনিক সিনেমা জগতের কোনো গান ও ভাবনা । আবার এটাও কিন্তু ঠিক কথা নয় যে, তারা তাদের সংস্কৃতি চর্চা ছেড়ে দিয়েছে । বিশ্বায়নের যুগে তারা আধুনিকতার ছোঁয়া পেয়েছে ঠিকই কিন্তু অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা ও হয়তো খারাপ অবস্থায় রয়েছে । সারাদিন যদি কারো খুঁজে বেড়াতে হয় দুবেলা পেটের খাবার তখন কি আর নাচ গান আসে ? সমকালীন অবস্থাটা চা বাগানগুলোর এরকম যে আধুনিকতার দরুন এখন ঘরে ঘরে টিভি রয়েছে, রয়েছে হাতে হাতে মোবাইল । দেখা যাচ্ছে সেইসব শ্রমিকরা যারা 'হাপ্তায়' (সপ্তাহে) একবার 'তলব' (মজুরি) নিচ্ছে দৈনিক ১০৫ টাকা করে, সেও ১০ টাকা ব্যায় করছে মোবাইল টকটাইম বা টপআপ কিনতে । এখানে উল্লেখ্য যে এতদিন দৈনিক মজুরি ছিল ৭৫ টাকা এবং হাফ হাজিরা ছিল ৩৭. ৫০ টাকা যা বর্তমানে সংশোধিত হয়ে ১০৫ টাকা দৈনিক মজুরি আর হাফ হাজিরা ৫২. ৫০ টাকা হয়েছে । আধুনিকতার ফলেই সে হয়তো সেই টপআপ দিয়ে ঘরে বসেই তার প্রিয়জনদের সাথে কথা বলতে পারছে । বা হয়তো মোবাইলে গান শুনছে, সিনেমা দেখছে, আসক্ত হচ্ছে নীল ছবিতেও । সবই সে করছে । আগে দিনের মজুরি ৭৫ টাকা দিয়েও করেছে আর এখন ১০৫ টাকাতেও করছে । টিভির মারফতে আসা বিজ্ঞাপন সাধারণ মধ্যবিত্তের, নিম্ন মধ্যবিত্তের বাঙালিদের যেরকম মগজ ধুলাই করে চলেছে, ঠিক তেমনি অশিক্ষিত চা জনজাতিদেরও প্রতি নিয়ত মগজ ধুলাই

করছে । ফলস্বরূপ তারা আর এখন গোল্লাসাবান বা বাংলা সাবান ব্যবহার করছে না, করছে কোনো কোম্পানির গন্ধ সাবান । পণ্য সংস্কৃতির দৌলতে সীমিত ক্ষমতার ভেতরেই সে ওগুলো ব্যবহার করছে। চা বাগান গুলো থেকে শিলচর শহর অনেক দূর, একটা বাগানের শ্রমিক যখন শুনতে পায় যে শহরে বড় বড় মল হচ্ছে তখন তারও ইচ্ছে জাগে সেই সব মল ঘুরে আসার, নতুন নতুন জিনিষ দেখার । আগের মানুষরা যেমন অল্পতেই তুষ্ট থাকত, তার গন্ধ সাবান লাগত না, মোবাইল লাগত না শহরে ঘুরার কোনো স্বপ্ন ও ছিল না; বিশ্বায়নের যুগে এসে এই অতৃপ্তিটা অন্যান্যদের মতো চা শ্রমিকের জীবনেও পড়েছে । এবং সেইসব চাহিদা পুরো করতেই সে মালিক বা প্রভুদের সংগে লড়াই করে চলেছে বেতন বাড়াও বলে যেখানে দৈনিক মজুরি ১০৫ টাকা বাড়ে না তখন তার শহরে যাওয়ার প্রবণতা শান্ত করতে যখন পারে না তখন সে চুরি করে, ডাকাতি করে । গাছ গাছালি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে থাকা প্রকৃতির ছেলে মেয়েরা তাদের চিকিৎসা ও করে নিত প্রকৃতির কাছ থেকেই । শরীরে ব্যথা, জ্বর, কাশি তারা জানত যে সজনার ডালের রস খেলে ব্যথা কমে, শেফালি ফুলের পাতার রস খেলে জ্বর কমে । আদা মধু খেলে কাশি কমে ; কিন্তু এখন বিশ্বায়নের যুগে এমনটা আর হয় না কারণ সে টিভি তে বিজ্ঞাপনে দেখে নিচ্ছে যে বাম লাগালেই ব্যথা কমে যাচ্ছে, তেল লাগালেই শরীরে ব্যথা কমছে । ভিক্স চকলেট খেলেই কাশি কমছে ইত্যাদি । সুতরাং প্রকৃতির জড়ি বুটি দিয়ে সে আর তার চিকিৎসা করছে না হারিয়ে যাচ্ছে যা সে জানত তার 'লোক ওষুধ' (ফোক মেডিসিন) গুলো । কিন্তু এখন বাম টেবলেট ইত্যাদি কিনছে এবং তার ঐতিহ্য থেকে সে দূরে সরে যেতে বসেছে।

- প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে যারা বাস করে তাদের আমরা, নাগরিক সমাজ, চা জনজাতি, আদিবাসি, লেবর এরকম নানা নামে ডাকি এবং হয়তো এর ফলেই তারা তাদের নিজেদেরকে আদিবাসি বলেই পরিচয় দিতে বাধ্য হয় । সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রম করে তলব করে দৈনিক ৭৫, যা বর্তমানে সংশোধিত হয়ে হয়েছে ১০৫ টাকা, তা ই হাজিরা ও সামান্য রেশন নিয়ে তারা তাদের জীবন যাপন করেন । যাদের জন্য শিক্ষার ভালো ব্যবস্থা নেই ; নেই স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা, অনেকেই বিনা চিকিৎসায় মারা যায়, মরতে হয় বলে হয়তো ! সরকারি সব রকমের সুযোগ সুবিধে থেকে ও যারা সহস্র যোজন দূরে বঞ্চিত যাদের রক্তঝরা অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রকৃতি সুন্দর হয়ে থাকে, আমরা যারা বছরে বা মাসে ছুটির দিনে প্রিয়জনদের নিয়ে সেই সবুজে ঘুরে আনন্দ নিই তারা একবার ও ভেবে দেখি না যে সেইসব প্রকৃতি রক্ষিতদের বাস্তব জীবনচিত্র আসলে আলাদা যা আমাদের সবার কাছে একেবারে অস্পষ্ট । আমরা কাছাড়ের ডলু বাগান, নগর বাগান ঘুরি পরিবার পরিজনদের নিয়ে পিকনিক করি কিন্তু কখনো চোখে পড়ে না সেইসব চা জনজাতি শিশুদের যারা আজও একুশ শতকে দাঁড়িয়ে রাস্তায় ন্যাংটা ঘুরে । অথচ দেখা যায় বাচ্চাটির হাতে রয়েছে হিন্দি সিনেমার গান বাজছে এমন একটি মোবাইল ফোনও ।

ব্রিটিশ উপনিবেশের ফলে আমাদের বরাক উপত্যকায় চা বাগানের পত্তনের সময় তারা ভীল, সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতি জনগোষ্ঠীদের ঝাড়খণ্ড, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি জায়গা থেকে যে চা শ্রমিকের লোভ দেখিয়ে এনেছে সেইসব শ্রমিকরা সংগে এনেছিল তাদের নিজস্ব লোক সংস্কৃতিও । হয়তো অন্যান্য লোকসংস্কৃতির মতো বরাক উপত্যকার চা জনজাতির

লোকসংস্কৃতি ও বিশ্বায়নের কবলে চাপা পড়ে যাচ্ছে দিন দিন । এখানে একটু বলে নেওয়া দরকার যে লোকসংস্কৃতি বলতে আমরা কি বুঝি প্রাচীন যুগ এবং সমাজের ও সভ্যতার অনেক কিছুর পরিচয় থাকে লোকসংস্কৃতির মধ্যে । 'লোক সংস্কৃতি' আলোচনায় 'লোক' বলতে কোনো একজন মানুষকে বোঝায় না, বোঝায় এমন একদল মানুষকে যারা সংহত একটি সমাজের বাসিন্দা অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট একটি ভূখণ্ডে তারা বসবাস করে, তাদের আর্থিক কাঠামো একই রকম ; জন্ম থেকে মৃত্যু এবং বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকলে এক ধরণের বিশ্বাস সংস্কার-আচরণ প্রথা পদ্ধতি, উৎসব অনুষ্ঠান পালন করে থাকে ।

- 'সংস্কৃতি' হল সভ্যতা জনিত উৎকর্ষ । এ উৎকর্ষ জীবন চর্যার । সংস্কৃতি অনুশীলনির্ভর, কাল পরম্পরায় বহমান, ক্রমবিবর্তন শীল ।

---'লোক সংস্কৃতি' হল তাই যাতে লোকসমাজের সভ্যতাজনিত উৎকর্ষের প্রতিফলন ঘটে । লোকসংস্কৃতিকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, যেমন বস্তুকেন্দ্রিক বিশ্বাস, অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক, খেলাধূলা কেন্দ্রিক, বাক্‌কেন্দ্রিক, অঙ্গিভঙ্গি কেন্দ্রিক, লিখন বা অংকন কেন্দ্রিক । যাদু ভেলকি ম্যাজিক। টোটেম-ট্যাবু এবং ইন্দ্রজালিক ক্রিয়া কলাপে সমগ্র লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতি ভরপুর । এরকমই বিশ্বাস সংস্কার, আচার আচরণ প্রথা পদ্ধতি, উৎসব, অনুষ্ঠান, যাদু, ভেলকি ম্যাজিক এবং ইন্দ্রজালিক ক্রিয়া কলাপে ভরপুর জীবন বরাকের চা জনজাতিদের । চা জনজাতিদের মধ্যে নাচ গানের রীতিটা সবচেয়ে বেশি তো আমরা সবাই জানি । 'ঝুমুর' হল চা বাগানের সবচেয়ে প্রচলিত নাচ । ঝুমুর গান করে করে নাচা হয়ে থাকে ।

বলা যায় যে নেচে নেচে তারা তাদের দুঃখ কষ্টের কথা বলে, পৃথিবীতে এমন জাতি আর কটা থাকতে পারে ! এখানে কয়েকটি ঝুমুর গানের উল্লেখ করা যায় এরকম -

(১) তুমি লাগো পরের পুত
তরো লাগি এত দুঃখ
তরো লাগি কান্দিছে মোর হিয়া
তুমি নাকি নিদারুণ প্রিয়া ।

(২) সান্‌ঝ সকালের বেলা
কে মারিল চালে ঢিলা
ঢেলা নাই গো দিদি
মিঠাইয়ের পুটলা ।

(৩) দেশ ছাড়ে আইলি আসাম
ভুলাই গেলি গো দেশেরো নাম
আসাম দেশে খুলোলি বাগান,
বেনাই দেলি বেনাই দেলি
হামরা সোনারো আসাম ।
কি বলিব বিরিটিশের কথা,
বাগান গড়িল এথা,
মজদুর চালান করিলো আসামে
রেল গাড়ি গো চলে ঘনে ঘনে ।

--এবারে প্রশ্ন জাগতেই পারে এমন সুন্দর গান রয়েছে যাদের তারা কি খুব ভালো ভাবে জীবন কাটাচ্ছে ? ধরে রাখতে পারছে কি তাদের অমন সুন্দর সংস্কৃতিকে ? নাকি সেখানে ও গ্রাস করেছে বিশ্বায়ন ? প্রযুক্তির বিস্ফোরণ, বাণিজ্যের বিশ্বায়ন প্রভৃতি সার্বিকভাবে আর সবার মতোই বরাকের চা জনজাতিদের মধ্যেও ভোগবাদী মানসিকতার জন্ম দেয়, আর এর প্রভাব শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও পড়েছে । শিল্পের চেয়ে ও বিনোদনের কদর হয়েছে বেশি । ফলে ঝুমুরের ঐতিহ্য যে নান্দনিক ঐতিহ্য সেটা থেকে প্রায় দূরে সরে যেতে বসেছে চা জনজাতি সমাজ । ক্ষেত্র সমীক্ষণ করতে গিয়ে চোখে পড়ে বরাকের চা জনজাতি সমাজের শ্রমিকরা, মহিলা শ্রমিকরা কাজে যেতে সময় যে পাতি তুলতে তুলতে, কাজ করতে করতে নিজস্ব গান করে করে গান গাইত নাচত এরকম আর দেখা যাচ্ছে না এখন । সকালে 'সাইরেন' (বাঁশির) সংগে সংগে তৈরি হয়ে কাজে যেতে সময় পকেটে মোবাইলটাকে বাজিয়ে হাঁটছে । আগে চা গাছের পাতা দিয়ে নিজেই কোনো ঝুমুরের ধুন বাজিয়ে বাজিয়ে কাজে যেত শ্রমিকরা । বেলা বারোটায় যখন টিফিন করার সুযোগ পাচ্ছে একটু সময় বাগানের স্থানীয় ভাষায় যাকে বলে, 'পানি খাবার সময়' তখন গাছের নীচে বসে চা খেতে খেতে মোবাইল বের করে হয় গান শুনেছে নতুবা প্রিয়জনকে ফোন করছে । ফলে আর শোনা যাচ্ছে না তাদের প্রচলিত কোনো ঝুমুর বা টুসু । "বারক উপত্যকার চা জনজাতি শ্রমিকরা একসময় আসামে আসে । সংগে নিয়ে আসে ভাষা আর সংস্কৃতি । নিয়ে আসে পূজা পরব । ছিল নিজেদের গানের বাজনাও , যেমন নাগরা, ঢাক, ধামসা, মান্দল, পাতার বাঁশি । কিন্তু সবাই এখন একটা কৃত্রিম সংস্কারে জড়িয়ে পড়ায় দিন দিন মিটে যাচ্ছে।"[৪]

পণ্য সংস্কৃতিতে অন্য কোথাও যাওয়ার দরকার নেই টিভি আর মোবাইল বড় ভূমিকা নিচ্ছে সব কিছু পাল্টে দিতে। বরাক উপত্যকার চা জনজাতিরা খুব সহজেই শুনতে পাচ্ছে 'ডিজে মিউজিক'। টিভিতে বিজ্ঞাপন দেখে নিচ্ছে কম্পিউটার এর মতনই আরেকটা রয়েছে ছোট কম্পিউটার যাকে বলে 'ট্যাবলেট'। বার বার বিজ্ঞাপন দেখিয়ে তার মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে খুব কম টাকায় সে এটা পেয়ে যেতে পারে, বিজ্ঞাপন দেখতে দেখতে সে বাধ্য হচ্ছে সেটা কিনে আনতে। সে এখন জানে, 'মেমোরি কার্ড' দিয়েই এখন গান শোনা যায়, ফলে 'কার্ড রিডার' লাগিয়ে গান শুনছে আর কার্ড রিডারকে বলছে 'কাডিটার'। শিক্ষার অভাবের জন্যই ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারছে না এটা বারবার নষ্ট হচ্ছে আর সে বারবার কিনে টাকা নষ্ট করছে। কোথাও নতুন জন্ম হয়েছে, বিয়ে লেগেছে তারা, 'সাউন্ড বক্স' বাজাচ্ছে। আগে যেখানে হয়তো তাদের প্রচলিত রীতি দিয়ে এটা তারা করতো, এখনও করছে কিন্তু প্রাধান্য বেশি পাচ্ছে সিনেমা জগতের গান ও ভাবনা। বলা নিষ্প্রয়োজন যে এগুলো সব একটা শ্রমিক করছে তার দৈনিক মজুরি ১০৫ টাকা দিয়েই। দিনরাত বাজারিকরণের গান শুনছে, 'ডিজে' শুনছে, 'মশাপ' শুনছে প্রভৃতি। ওগুলো শুনতে শুনতে সহজেই সে বুঝে নিতে পারছে যে আধুনিক যন্ত্রানুসঙ্গে নতুন স্বাদে স্রোতাদের কাছে আসছে সুর যা এই প্রজন্ম বেশ ভালো ভাবেই গ্রহণ করছে। ফলে তারা ও বুদ্ধি করে তাদের গানে এখন অনেক সংমিশ্রণ ঘটাচ্ছে। আগে যেখানে মাদল আর গলা দিয়েই তারা সুর টেনে রাখত ঝুমুরের। তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখা যায়, কিছুদিন আগে কাছাড়ের নারাইনছড়া চা বাগানে বরাক উপত্যকার সামাজিক সংস্থা 'কোরাস' আয়োজিত এক ঝুমুর কাঠি নাচের অনুষ্ঠানে, লম্বাটিলা, মৈষাখাল,

নুনছুরি, চৈলতাটিলা, চাপাকোনা দীননাথ টিলা, বাঁশটিলা, পাদ্রিটিলা প্রভৃতি নিয়েই এই চা বাগানের জনজাতিরা তারা অংশগ্রহণ করে অনুষ্ঠানে । বরাক উপত্যকার অন্যান্য জনজাতিদের মতোই এরাও প্রতিদিন পরিবর্তিত হচ্ছে । এদেরও পেটের দায়ে পাড়ি দিতে হচ্ছে বেঙ্গালোর, মেঘালয়, চেন্নাই । কারণ বাগানে কাজ নেই, বস্তিবাড়িতে কাজ নেই, বাধ্য হচ্ছে তারা বাড়ি ছাড়তে । সেখানেও হয়তো তারা হচ্ছে নির্যাতনের শিকার । ফলে খুব সহজেই ভুলে যাচ্ছে তাদের ঝুমুর নাচ, কাঠি নাচ ইত্যাদি, কারণ একটাই আর্থিক অবস্থা । সেইসব বাগানের শ্রমিকদেরকে তারা এখন আর কেন নাচ গান করে না কেন জিজ্ঞেস করা হলে তারা বলে যে তাদের এখন পেটের খাবার যোগাড় করতে করতেই দিন কেটে যায়, পরব কবে আসে কবে নাচবে মনে থাকে না । তাহলে কি আমরা বলব ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সমাজই ভালো ছিল ? কোথাও কোথাও তাদের সাথে কথা বলতে গিয়ে কেউ কেউ এরকম বলেছেন যে ব্রিটিশরা পেটে লাথি মারত না । তথ্য সংগ্রহে দেখা যায়, ঐ বাগানের চা শ্রমিক মিলন কল, সুধীর মুণ্ডা, বিজন মুণ্ডারা বলেছেন যে চা বাগানের ছেলেরা এখন সবাই বাইরে চলে যাচ্ছে, মেয়েরা বাগানের বাইরে বাবুদের বাড়িতে 'বিল্ডিং ঢালাইয়ের' কাজে চলে যাচ্ছে ফলে নাচ গানের আসর খুব একটা নেই, আর তাছাড়া অভাব অনটন তো লেগেই থাকে । চা বাগানে যারা একদল রয়েছে কোনো উৎসবের সময় যেমন 'দোল' ইত্যাদি উৎসবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাঠি নাচ করে । তাদের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে তাদের সেইসব গান বাইরে বাবুদের বাড়িতে বেশি জমে ওঠে না, শুনে কেউ টাকাও বেশি দেয় না, কেউ কেউ তো আবার তাদের দেখে দরজা বন্ধ করে দেন পয়সা দেবার ভয়ে । ফলে এবার তারা ও বুঝে গেছে যে গানগুলো এবার

মালমশলা দিয়ে বাজারে ছাড়তে হবে । ফলে তারা সেটাকে পেশাগত করে ঝুমুর তালের সংগে বিহু এবং আধুনিক বলিউডের সিনেমা জগতের নাচের মিশ্রণ ঘটিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করার চেষ্টা করছে । বিশ্বায়নই তাদের শিখিয়ে দিয়েছে কি করে বাজারিকরণ করতে হয় । এবার তারা 'আসাম দেশে খুলোলি বাগান, বেনাই দিলি হামরা সোনারো আসাম' এই ঝুমুরটাই গাইছে কিন্তু সেটাকে যন্ত্রানুসঙ্গ দিয়ে, অন্য তাল মিশিয়ে জনপ্রিয় করে টাকা রোজগার করতে চাইছে । তারা কাজ করছে সাহেবের বাংলোয় ; কিন্তু রাস্তায় বেরুলে এখন তারা ও নিজেকে সাহেবের মতো দেখাতে চায়, কিংবা কোনো সিনেমার নায়কের মতো । কারণ বিশ্বায়ন তাকে শিখিয়ে দিচ্ছে কি করে চুল কাটতে হয় স্টাইল করে, কি করে চশমা পড়তে হয় ইত্যাদি ।

– সুতরাং বলতে কোথাও বাধা নেই যে শোষণ, বঞ্চনা, প্রতারণা, দারিদ্রতা এখনো এই জনগোষ্ঠীর পিছু ছাড়ে নি । শিক্ষা চিকিৎসা আর পুষ্টির ওভাবে সীমাহীন কষ্টের সাথে প্রতিনিয়ত যারা দিন গুনছে তারা অন্যান্য মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্তের মতোই সমকালীন পণ্য সংস্কৃতিতে আসক্ত । তবে আমাদের এই বিশ্বাস রেখেই এগিয়ে যেতে হবে যে, লোকসংস্কৃতির উত্তরাধিকার আমাদের ধমনীর ভেতরে রয়েছে জিনকোষের মতই ; ফলে বিশ্বায়ন যতই আর্থসামাজিক মুমূর্ষূতা ঘটাক না কেন, শেষ পর্যন্ত ঐ লোকায়ত ঐতিহ্যই বাঁচিয়ে রাখবে মানুষকে পরবর্তী সূর্যোদয়ের জন্য ।

তথ্যসূত্র

১। লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ,পল্লব সেনগুপ্ত, পুস্তক বিপণি, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, পৃষ্ঠা, ২১ ।

২। লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ,পল্লব সেনগুপ্ত, পুস্তক বিপণি, বানিয়াটোলা লেন, কলকাতা, পৃষ্ঠা, ৩৬৯ ।

৩। লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পল্লব সেনগুপ্ত, পুস্তক বিপণি, বানিয়াটোলা লেন, কলকাতা, পৃষ্ঠা, ৩৭০ ।

৪। হামদের বাত, কাজল দেমতা (সম্পাঃ), সম্পাদকীয় কলাম, সংখ্যা ১০, জানুয়ারি ২০১৪ ইং। (বাংলা অনুবাদ)